শিল্পিত প্রার্থনা

ঈশিতা সেনগুপ্ত ভারতের প্রত্যন্ত প্রান্তের শিল্প ইতিহাস নিয়ে লিখছেন নিয়মিত। এবারে লিখছেন রাজস্থানের মণ্ডল শিল্প নিয়ে।

ভারতের প্রতিটি প্রান্তেই বোধহয় ঘরের কোণে ছবি এঁকে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করা হয়। সে আমাদের বাঙালী ঘরে লক্ষ্মীপুজোর আলপনাই হোক বা রাজস্থানের কোন মীন গৃহস্থের বাড়ীই হোক – সর্বত্রই যেন এক চিত্র। আর সংসার যেহেতু রমণীর গুণেই সুন্দর হয়, তাই ছবি এঁকে গৃহলক্ষ্মীকে আবাহনের কাজটাও করেন মহিলারাই। গৃহে সুখ-শান্তি আনয়ন, গৃহদেবতার আবাহন ও নানান উৎসব অনুষ্ঠানে আঁকা হয় এই মণ্ডন শিল্প।

পূর্ব রাজস্থানের টোংক ও সাওয়াই-মাধোপুরে এই মীন উপজাতির বাস। মীন মহিলারাই সুখ সমৃদ্ধির আশায় দেওয়াল, উঠোন নিকিয়ে তার গায়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তোলেন দ্বিমাত্রিক এক ছবির ভূবন। হোলি, নবরাত্রি, দীপাবলী, মকর-সংক্রান্তি ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেওয়ালের গায়ে ছবি এঁকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাওয়া হয়। বিবাহ ও অন্যান্য যে কোনও শুভকাজে যেন ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হয় – এই নিরুচ্চার প্রার্থনাতেই আঁকা হয় মণ্ডন শিল্প।

আবার কখনো বা নিজের বাড়ীর ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকু পেরিয়ে বৃহত্তর সমাজের কথাও ভাবেন মীন মহিলারা। যে কুয়ো থেকে জল আনতে যান তাঁরা প্রতিদিন তাকেও সাজিয়ে তোলেন সবাই মিলে। ছবি এঁকে সর্বশক্তিমানের কাছে একটাই আকুতি – সারাবছর যেন জল থাকে এই কুয়োতে। জলই যে জীবন।

স্থানীয় মাটি, গোবর ও খড়কুটো মিশিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা পায়ে দলে তাকে নরম করা হয়। তারপর দেওয়ালে সেই মসৃণ মাটির প্রলেপ দেওয়া হয় হাত দিয়ে। পরিশ্রমসাধ্য এই কাজ শেষ হবার পর সেই লাল বা মেটে রঙের দেওয়ালের ওপর সাদা চুন বা খড়িমাটি গুলে তাতে তুলো চুবিয়ে আঁকা হয় খেজুর ছড়ি। এইভাবে দু-রঙা চিত্রমালায় সেজে ওঠে মীন গৃহকোণ।

বিষয় হিসাবে মূলতঃ উঠে আসে গণেশ, ফুল, ময়ূর ও বাঘ। তাছাড়াও মহিলা হবার সুবাদে কর্মরতা রমণীও তাদের ছবির আঙিনায় বিষয় হিসেবে উঠে আসেন। ছবিগুলিতে

অদ্ভুত এক ছন্দ লক্ষনীয়। আর আশ্চর্যের বিষয় ছবিগুলির আকার। সেগুলি কখনো চৌকো, কখনো আয়তাকার, আবার কখনো বা তেকোনা। কখনো আবার যেন তারার আকার পায় এই বিশেষ ছবিগুলি। কখনো বা প্রয়োজনের তাগিদে বৃত্ত বা ত্রিভূজ আঁকা হয় সুতোর সাহায্যে। মাপ নেওয়া হয় হাতের মাপে। মণ্ডনচিত্রের চারপাশে ক্ষুদ্রতর নক্সা এঁকে বর্ডার দেওয়া হয়। ধারের সেই ছবিগুলি বেশীরভাগই পায়ের ছাপ – ঘরের দরজা বা গৃহদেবতার পদচিহ্ন স্বরূপ আঁকা হয়ে থাকে সেগুলি। গৃহদেবতা গৃহস্থের ঘরে পা রাখবেন – শুধু এইটুকুই আর্তি এই বাঙ্ময় ছবিগুলির।

এইসব শিল্পীরা মহিলা হলেও এতটুকু লজ্জাবনতা নন। ছবির তলায় তাঁরা শিল্পিত বলিষ্ঠতাতেই নিজেদের নাম সই করেন। অবশ্য সমষ্টিগতভাবে অঙ্কিত ছবিগুলিতে তাঁদের নামধাম পাওয়া যায় না।

এই ছবিগুলি মূলত মীন রমনীরা গ্রীষ্মকালেই আঁকেন। হয়তো ছবির জমি স্বরূপ দেওয়ালটি গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় – সুবিধা হয় শিল্পীদের। কিন্তু সারা বছর রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ছবিগুলির রঙ কিছুটা হাল্কা হয়ে যায়। তারপর আবার নতুন করে দেওয়াল লেপে তৈরি হয় নতুন কোনো রূপকল্পনা। এইভাবেই যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে এই শিল্পধারা। মণ্ডনচিত্রের প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই মহারাষ্ট্রের রঙ্গোলিতে, কেরালার কোলামে, বাংলার আল্পনায়। বিহারের আরিপান, উত্তরাঞ্চলের থাপনা, গুজরাটের সাথিয়া – হয়তো নাম আলাদা, ঢং আলাদা, করণ কৌশল আলাদা – কিন্তু সবখানেই শিল্পী সেই গৃহলক্ষ্মী মহিলারাই। ছবি এঁকে আবাহন জানান প্রাণের ঈশ্বরকে।

এত স্বকীয়তাপূর্ণ এই চিত্রকলা তবু কিন্তু ক্রমশই আমরা দেখতে পাচ্ছি এর অধোগতি। মীন জাতি এখন তাদের মাটির বাড়ী ছেড়ে বানাচ্ছে সিমেন্টের পাকাবাড়ী। মীন মহিলারা তাদের প্রার্থণা, তাদের কল্পনা প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় চিত্রপট তার পাচ্ছেন না। হারিয়ে যেতে চলেছে পরম্পরাবাহিত এই শিল্পধারা।

এরই মধ্যে সুনীতার কাহিনি আমাদের মনে একটু আশার সঞ্চার করে। মীন-পরিবারজাত এই মহিলার খুব অল্প বয়েসেই মা ঠাকুমার কাছে হাতেখড়ি জাতিগত এই বিদ্যার। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে পাকাবাড়ীতে উঠে এসে হারিয়ে যায় তাঁর সেই দেশজ চিত্রপট। কিন্তু স্বামীর অনুপ্রেরণায় একটি বইয়ের অলংকরণ করতে গিয়ে দেখেন কাহিনিগুলোতে তাঁর ছোটবেলার ছবির সাথে মিলে যাচ্ছে কোনো এক জায়গায়। তখন তিনি

মণ্ডন শৈলীতেই এঁকে ফেলেন সেই বইয়ের ছবিগুলি। বলা বাহুল্য, বহুল প্রশংসিত হয় এই অন্যরকম অঙ্কনরীতি। এরপর তাঁর স্বামীর একটি বই প্রকাশিত হয়, তার পাতাগুলিও তিনি ভরিয়ে তোলেন মণ্ডনচিত্রে। এভাবে দেওয়ালের বদলে কাগজের মাধ্যমেই তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন শতাব্দী প্রাচীন এই শিল্পধারা। হয়তো এরকম আরো অনেক সুনীতার হাত ধরেই কালের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত হতে থাকবে মণ্ডন চিত্রাবলী।